প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কল্যাণে নিবেদিত ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার (বিআরসি)-এর যাত্রাশুরু

২৮ মে ২০২২, ঢাকা

বাংলাদেশের প্রান্তিক ও বাদ-পড়া জনগোষ্ঠীসমূহের কল্যাণে নিবেদিত দীর্ঘদিনের কাঙ্খিত জাতীয় প্রতিষ্ঠান ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার (বিআরসি)-এর আনুষ্ঠানিক যাত্রাশুরু ২৮ মে ২০২২, ঢাকায় এক উৎসবের মধ্য দিয়ে। পাশাপাশি এই অনুষ্ঠানে ১১টি বই ও মনোগ্রাফের প্রকাশনা উৎসব এবং একটি তথ্যচিত্রের উদ্বোধনী প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং ইকো কোঅপারেশন-এর সহযোগিতায় এসব বই ও মনোগ্রাফ প্রকাশিত হয়েছে এবং তথ্যচিত্রটি নির্মিত হয়েছে। 'প্রোমোটিং হিউম্যান রাইটস অব মার্জিনালাইজড গ্রুপস ইন বাংলাদেশ থ্রু ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার' শীর্ষক প্রকল্পের মাধ্যমে বিআরসি'র জন্য আর্থিক সহায়তা দিচ্ছে উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কারিতাস ফ্রান্স এবং মিজেরিওর (জার্মানি)।

সেড, পিপিআরসি এবং অন্যান্য বিপুলসংখ্যক প্রতিষ্ঠান যারা তিন দশক ধরে একত্র হচ্ছে বিআরসি'র আনুষ্ঠানিক যাত্রাশুরু এবং প্রকাশনা উৎসব তাদের জন্য একটি বড় আনন্দের দিন। বিআরসি'র যাত্রাশুরু অনুষ্ঠানে যে বার্তাটি সবার কাছে পৌঁছে দেয়া হয়েছে তা হলো বিআরসি পরিচালনার দায়িত্বে সেড ও পিপিআরসি থাকবে বটে, কিন্তু প্রান্তিক জনগোষ্ঠী হবে এই সেন্টারের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং মূল শক্তি। বিআরসি'র উদ্দিষ্ট নয়টি প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, মানবাধিকারকর্মী, গোষ্ঠীভিত্তিক প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজ, অর্থনীতিবিদ, ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক এবং বিদেশী কূটনীতিকদের প্রতিনিধিবৃন্দসহ অন্তত ১৪১ জন এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন। সত্যিকার উৎসবের আমেজ অনুষ্ঠানস্থল ঢাকার সিরডাপ মিলনায়তনকে আলোকিত করে।

ড. হোসেন জিল্লুর রহমান

অনুষ্ঠানের আয়োজক সেড ও পিপিআরসি সবাইকে যে বার্তাটির মাধ্যমে স্বাগত জানায় তা হলো দশকের পর দশক ধরে কাজ করতে করতে বিভিন্ন ধরণের ও মাত্রায় দুর্বল ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী আজ এ উৎসবে যোগ দিয়েছে এবং এসব জনগোষ্ঠীকে আমরা যেন দুর্বল ও অসহায় না ভাবি। এরা সবাই সম্ভাবনাময় এবং বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতি ও ভাষাসমৃদ্ধ এবং এসব জনগোষ্ঠীর অনেক শক্তিও আছে।

অনুষ্ঠানে মূল বক্তব্য উপস্থাপনকালে বিআরসি'র কর্মসূচি পরিচালক ফিলিপ গাইন এর পটভূমি, উদ্দেশ্য, কার্যক্রম এবং এর উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীসমূহ কীভাবে প্রকৃত অংশগ্রহণকারী তা ব্যাখ্যা করেন।

যেসব প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য ব্রাত্যজন (যার অর্থ প্রান্তিক মানুষ) রিসোর্স সেন্টার তাদের মধ্যে অন্যতম আদিবাসী (ক্ষুদ্র জাতিসত্তা), চা জনগোষ্ঠী (৮০টি জাতিগোষ্ঠী), যৌনকর্মী, হিজড়া, বেদে, হরিজন, ঋষি, কায়পুত্র, জলদাস এবং বিহারি।

"বিআরসি'র যাত্রাশুরু অনুষ্ঠান ও প্রকাশনা উৎসব সবার জন্য একটি বড় উদযাপন এই কারণে যে এই সেন্টারের ভিত্তি হচ্ছে নিরপেক্ষ ও বস্তুনিষ্ট জ্ঞানসম্পদ (বই, মনোগ্রাফ, অনুসন্ধানী রিপোর্ট, তথ্যচিত্র, আলোকচিত্র ইত্যাদি)," বলেন গাইন। "এসব জ্ঞানসম্পদ আমাদের দীর্ঘদিনের অনুসন্ধানী রিপোর্টিং, গুণগত ও পরিসংখ্যানগত গবেষণা, জরিপ, ভিডিও ডকুমেন্টেশন, তথ্যচিত্র নির্মাণ এবং বিশ্লেষণের ফসল।" বিভিন্ন প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং অন্যান্য অংশীদারদের সক্রিয় অংশগ্রহণে কীভাবে এসব জ্ঞানসম্পদ তৈরি করা হয়েছে সে সম্পর্কেও তিনি ব্যাখ্যা দেন। যেসব প্রকাশনা ও অন্যান্য উপকরণের উপর বিআরসি'র ভিত্তি রচিত হয়েছে সেসবের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ দিক হচ্ছে সেড ও সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ বিআরসি'র উদ্দিষ্ট প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসমূহের অধিকাংশেরই আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং সমস্যার মানচিত্রায়ণ ও সংজ্ঞায়ন করেছে। পাশাপাশি এসব প্রকাশনা ও উপকরণ যে বিশ্বব্যাংক, এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, জাতিসংঘ, সরকারি সংস্থা এবং বেসরকারি সংস্থাসমূহের সুনির্দিষ্ট বিষয়ে (বন, মৎস্য চাষ, উন্মুক্ত কয়লা খনি, চা শ্রমিকের মজুরি ইত্যাদি) নীতিমালা ও কৌশলের উপর প্রভাব ফেলেছে তা তথ্য-উপাত্ত দ্বারা সমর্থিত। তাই এসব জ্ঞানসম্পদের উপর বিভিন্ন পর্যায়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, শিক্ষাবিদ এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অভিজ্ঞরা আস্থা রেখেছেন।

বিআরসি'র অন্যতম কাজ হবে প্রান্তিক ও বাদ-পড়া জনগোষ্ঠীর উপর গবেষণালব্ধ জ্ঞানসম্পদ নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা, গোষ্ঠীভিত্তিক ও বিষয়ভিত্তিক এজেন্ডা তৈরি, সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচিতে প্রান্তিক ও বাদ-পড়া মানুষদের অন্তর্ভুক্তি বাড়াতে গবেষণা ও অনুসন্ধান চালানো, এসব গোষ্ঠী নিয়ে যারা

কাজ করে তাদের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা, তথ্যের ঘাটতিসমূহ পূরণ করা, তথ্যের প্রতি সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করা, সকল ক্ষেত্রে জ্ঞানসম্পদের ব্যবহার বাড়ানো, প্রান্তিক ও বাদ-পড়া জনগোষ্ঠীর মানুষদের জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনয়নে অবদান রাখা, ইত্যাদি।

প্রান্তিক ও বাদ-পড়া নয়টি গোষ্ঠীগুচ্ছের ১০ জন প্রতিনিধির বক্তব্য ছিল যাত্রাশুরু উৎসবের প্রধান অনুষঙ্গ। কারণ গোষ্ঠী প্রতিনিধিরা তাদের বক্তব্যে তারা কীভাবে সেড ও পিপিআরসির সাথে গবেষণা, অনুসন্ধান, জ্ঞানসম্পদ তৈরির কাজে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন এবং কীভাবে এসব জ্ঞানসম্পদ তাদেরকে ও তাদের গোষ্ঠীকে শক্তিশালী করেছে, সেসব নিয়ে তাদের ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠী অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন। তাদের সবার বিশ্বাস সঠিক তথ্য ও জ্ঞান উপকরণ হাতে নিয়ে তারা তাদের অধিকার আদায়ে সোচ্চার হতে পারবেন এবং সরকারি ও বেসরকারি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী বা নীতিনির্ধারকদের উপর প্রভাব ফেলতে পারবেন। বিআরসি এক্ষেত্রে তাদেরকে তথ্য-উপাত্ত ও পরামর্শ দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারবে। গোষ্ঠী প্রতিনিধিরা বিআরসির নিকট তাদের কী কী প্রত্যাশা রয়েছে তাও তুলে ধরেন।

যাত্রাশুরু উৎসবে গোষ্ঠী প্রতিনিধি হিসেবে যারা কমিউনিটি কণ্ঠ বা বক্তব্য দিয়েছেন তারা হলেন রামভজন কৈরী, নির্বাহী উপদেষ্টা, বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন; সৌদ খান, বেদে নেতা, মুন্সীগঞ্জ; ইউজিন নকরেক, সভাপতি, জয়েনশাহী আদিবাসী উন্নয়ন পরিষদ; জুয়ামলিয়ান আমলাই, মানবাধিকার কর্মী, পার্বত্য চট্টগ্রাম; শিউং খুমি, মানবাধিকার কর্মী, পার্বত্য চট্টগ্রাম; আলেয়া আক্তার লিলি, সভাপতি, সেক্স ওয়ার্কারস নেটওয়ার্ক; মিলন কুমার দাস, নির্বাহী পরিচালক, পরিত্রাণ; কৃষ্ণ লাল, সভাপতি, বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ; এম শওকত আলী, সাধারণ সম্পাদক, স্ট্রান্ডেড পাকিস্তানিজ জেনারেল রিপাট্রিয়াশেন কমিটি; এবং ইভান আহমেদ কথা, সচেতন হিজড়া অধিকার সংঘ (তারা যে অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছেন তার সারসংক্ষেপ এই রিপোর্টের শেষাংশে যুক্ত করা হয়েছে)।

অধ্যাপক ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ

প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে যথাযথ পরিকল্পনা না নেয়ায় সরকারের সমালোচনা করেন যাত্রাশুরু উৎসবের প্রধান অতিথি দেশের শীর্ষ অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ড. ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সুরক্ষায় সঠিক নীতিমালা ও কৌশল প্রণয়নের ব্যাপারেও তিনি আলোচনা করেন।

"প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা ও উন্নয়নের জন্য সঠিক নীতিমালা ও পরিকল্পনা নেয়ার প্রতি সরকারের পক্ষ থেকে মনোযোগ দেয়া হয়নি। এখানে সরকারের ব্যর্থতা রয়েছে বলে আমি মনে করি," বলেন অধ্যাপক মাহমুদ। "সরকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষদের জন্য সঠিক নীতিমালা ও পরিকল্পনা নিতে ব্যর্থ হওয়ায় দেশের সাধারণ নাগরিকদের থেকেও বিভিন্ন ক্ষেত্রে তারা অনেক পিছিয়ে আছেন।"

"বাংলাদেশে উন্নয়নের ধ্যান-ধারণাগুলো সহজেই শ্রেণি-গোষ্ঠী নির্বিশেষে দেশের সাধারণ নাগরিকদের কাছে পৌঁছায়। কিন্তু আদিবাসী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জন্য উন্নয়নের যে ধরনের ধ্যান-ধারণা নেয়া উচিত ছিল তা না নেয়ায় ও সেদিকে নজর না দেয়ায় সেসব তাদের কাছে ঠিকমতো পৌঁছায় না। কারণ তাদের শ্রেণিগত ও গোষ্ঠীগত পরিচয় এখানে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। এটি সরকারের ব্যর্থতা।"

"সরকার শুধু যে উন্নয়নের ধ্যান-ধারণা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কাছে ঠিকমতো পৌঁছাতে ব্যর্থ হয়েছে তাই নয়, বরং এসব গোষ্ঠীর জীবন-জীবিকার উপযোগী যেসব ধ্যান-ধারণা একটু ঈষৎ পরিবর্তন করে দেয়ার কথা ছিল, সেভাবেও চিন্তা করা হয়নি। বরং বাংলাদেশে এমন অনেক উন্নয়ন নীতি ও পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে যা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক না হয়ে উল্টো প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে।"

"এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় (এসডিজিতে) দেশের পরিবেশ-প্রতিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে স্থান পেয়েছে। কিন্তু প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসমূহ, যাদের জীবন-জীবিকা প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, তারা অবহেলিত ও বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে।"

বাংলাদেশে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে যথাযথ নীতি ও পরিকল্পনার অভাব রয়েছে। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক মাহমুদ উৎসবে আগত গোষ্ঠী প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে বলেন, "আমাদের বা ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টারের কাজের প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনাদেরকে যেন ভবিষ্যতে 'প্রান্তিক' কথাটি বলতে না হয়। আপনারা যাতে নিজেদের গোষ্ঠীগত ঐতিহ্য, ভাষা, বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতি, নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বজায় রেখেও বাংলাদেশের উন্নয়নের মূলধারায় অবদান রাখতে পারেন। যাতে ভবিষ্যতে আপনাদেরকে মূলধারার জনগোষ্ঠীর একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করা হয়।"

যাত্রাশুরু উৎসবে উপস্থাপিত গবেষণালব্ধ প্রকাশনাসমূহ সম্পর্কে তিনি বলেন, "আজকে যেসব গবেষণাধর্মী প্রকাশনার মোড়ক উন্মোচন করা হয়েছে এগুলো অত্যন্ত তথ্যসমৃদ্ধ প্রতিবেদন। এগুলো প্রথাগত জরিপ নয়। এগুলো হচ্ছে মাঠপর্যায়ে আপনাদের জীবন-জীবিকা সম্পর্কে নিবীড় পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়নসমৃদ্ধ প্রামাণিক দলিল বা ডকুমেন্টেশন। এসব পলিসি রিকমেন্ডশনের কাজ অনেক সহজ করে দেয়।"

"সেড ও পিপিআরসির এসব প্রকাশনা অনেক পলিসি ইস্যুকে সামনে নিয়ে এসেছে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সরকারের সাথে সংলাপে বসতে ভূমিকা রেখেছে। বিভিন্ন জরিপ পরিচালনা ও তথ্য-উপাত্ত উৎপাদনের কাজে জড়িত সরকারি সংস্থাসমূহকে আরো ভালো ফলাফলের জন্য বিআরসি'র গবেষণালব্ধ তথ্য-উপাত্ত

জেরেমি অপ্রিটেসকো

ও বিশ্লেষণসমূহ তুলনা করে দেখা উচিৎ, বলেন অধ্যাপক মাহমুদ যিনি সরকারি অনেক সংস্থায় সভাপতি ও পরামর্শক হিসেবে আছেন।

ডেলিগেশন অব দ্য ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন টু বাংলাদেশ-এর ডেপুটি হেড অব মিশন, জেরেমি অপ্রিটেসকো, যাত্রাশুরু অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে কথা বলেন। তিনি বলেন, "এই যাত্রাশুরু অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে বোঝা যাচ্ছে যে ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার এবং এতে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে দৃঢ় যোগাযোগ ও সংশ্লিষ্টতা তৈরি হয়েছে।" "টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার অন্যতম লক্ষ্য 'কাউকে পেছনে ফেলে নয়', সামনে রেখে ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার সঠিক সময়ে যাত্রা শুরু করলো। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীসমূহ পিছিয়ে আছে। তাদের অধিকারের জন্য কাজ করা এবং একই সাথে তাদেরকে অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা খুব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা খুব গর্বিত যে ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন এই উদ্যোগে সহায়তা দিয়েছে। কৌশলগত নীতিনির্ধারণের জন্য জ্ঞান ও তথ্যভাণ্ডার সাহায্য করবে। ধর্ম, বর্ণ, লিঙ্গ, পেশা, যৌন-আচরণ, গোষ্ঠী ও ভাষার কারণে বৈষম্য সমাজে বিদ্যমান। আমরা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিরাপত্তার ব্যাপারটিও গুরুত্বের সাথে দেখছি।"

ড. লিলি নিকোলস

আরেক বিশিষ্ট অতিথি বাংলাদেশে কানাডার হাই কমিশনার ড. লিলি নিকোলস বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর কথা শোনার পর তার অনুভূতি ব্যক্ত করেন। তিনি প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে বলেন, "আপনাদের ভাষা এবং সাংস্কৃতিক পরিচয়ের জন্য আপনারা যেসব বৈষম্যের শিকার হন, তা আমাকে জানানোর জন্য অনেক ধন্যবাদ। সব থেকে প্রশংসনীয় হলো আপনারা আপনাদের সাথে ঘটা বৈষম্যের সমাধান কী হতে পারে, সে ব্যাপারে পরামর্শ দিচ্ছেন। আমরা বৈষম্য বিলোপ, প্রান্তিকতা এবং নারীবাদী কার্যক্রমের প্রতি গভীরভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।" নিজের দেশ সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, "কানাডা হচ্ছে এমন একটি দেশ যেখানে সহিংসতা থেকে বাঁচতে মানুষ আশ্রয় নেয়। জাতিগত, ধর্মীয় ইত্যাদি বৈচিত্রের প্রতি কানাডা খুবই সহনশীল।"

বিশিষ্ট নারীবাদী এবং উন্নয়নকর্মী খুশী কবীর ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার-এর যাত্রাকে সাধুবাদ জানিয়ে বলেন এই রিসোর্স সেন্টারটি বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী এবং এর সাথে সম্পৃক্তদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। মিস

কবির বলেন, "সেড যেসব গবেষণা করে সেগুলোর সাথে এসব জাতিগোষ্ঠীর গভীর সম্পৃক্ততা আছে। সমাজ, আইন প্রণেতা, নীতিনির্ধারক, সাংবাদিকদের কাছে বিভিন্ন ধরণের তথ্য পৌঁছে দেওয়ার জন্য এটি একটি গুরত্বপূর্ণ সেন্টার এবং এসব তথ্য জাতিগোষ্ঠীসমূহ এবং উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর সাথে গভীর আলোচনার ক্ষেত্রে খুবই সহায়ক হবে।"

খুশী কবীর

খুশী কবীর আরও বলেন, "ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার-এর উচিত প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষদের ভূমি অধিকারের বিষয়ে মনোযোগ দেওয়া। অনেকের কোনও জমি নেই এবং অনেকে আছে যে ভিটায় তারা থাকে তার মালিকানা তাদের নেই। খুশী কবীর প্রতিশ্রুতি দেন, "আমি সবসময় ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার-এর সাথে আছি।"

আজকের পত্রিকার সম্পাদক, সাবেক প্রধান তথ্য কমিশনার এবং সেড-এর সদস্য অধ্যাপক মো: গোলাম রহমান প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যারা নিজেদের জাতিগত পরিচয় এবং পেশার কারণে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন, তাদেরকে সমাজে অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে বিশেষভাবে বলেছেন। প্রফেসর রহমান বলেন, "আমরা সবাই এদেশের নাগরিক এবং প্রত্যেক্যেরই সমান গুরুত্ব পাওয়া উচিত কিন্তু যারা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী তারা ইতিবাচক বৈষম্যের দাবিদার। প্রতিরোধ কার্যক্রম সমস্যা সামনে নিয়ে আসে বটে, তবে সমস্যার মূল কারণ ও প্রতিরোধ কার্যক্রমের উদ্দেশ্য কখনো কখনো পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় হারিয়ে যায়। আমলাতন্ত্র এই কারণগুলোকে আবার সচল হওয়া থেকে আটকায়। এক্ষেত্রে ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার-এর শক্তিশালী তথ্যভাণ্ডার গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে।

অধ্যাপক মো: গোলাম রহমান

ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার-এর যাত্রাশুরু উৎসবে সভাপতিত্ব ও সঞ্চালনা করেন বিআরসির গবেষণা উপদেষ্টা, পিপিআরসি-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান ও ব্র্যাক বাংলাদেশের চেয়ারম্যান ড. হোসেন জিল্লুর রহমান। অনুষ্ঠানে উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং সেডের সদস্য ড. তানজিমুদ্দিন খান।

ড. রহমান বক্তাদের আলোচনার সারসংক্ষেপ তুলে ধরে প্রান্তিক এবং বাদ-পড়া জনগোষ্ঠীসমূহের প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহের উপর আলোকপাত করেন। এসব প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অনেকে অদৃশ্য থাকছে। যাদের অনেকেই সমাজের চিন্তা-ভাবনা, বিবেচনার অন্তর্গত নয়, এককথায় সমাজের চোখে যারা অদৃশ্য, তাদের কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয়কে গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি তার সূচনা বক্তব্যে বলেন, ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার-এর যাত্রাশুরু অনুষ্ঠান বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীসমহূকে একত্রিত হওয়ার এবং তারা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়, তা নিয়ে কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছে। সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ হলো সমাজের মূল স্রোতের মানুষের কাছে এসব জাতিগোষ্ঠীকে দৃশ্যমান করে তোলা এবং একই সাথে তাদের মধ্যকার সম্ভাবনা ও কর্মদক্ষতাগুলো তুলে ধরা।

ড. তানজিমুদ্দিন খান

ড. রহমান আরও বলেন "আমরা গবেষণা এবং ফলাফল-ভিত্তিক কর্মের মাধ্যমে এসব মানুষের জন্য সুনির্দিষ্ট অগ্রগতি চাই। আমরা বিগত ত্রিরিশ বছরের কাজ উদযাপন করছি। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে বিভিন্ন গোষ্ঠী বিপন্নতার দিক থেকে আলাদা। তবুও তারা তাদের প্রান্তিকতায় ঐক্যবদ্ধ। বিআরসি তাদের ঐক্যের প্রকৃতি তুলে ধরে।"

তিনি প্রধান বক্তা ফিলিপ গাইনের বক্তব্যের উপরে গুরুত্ব আরোপ করে বলেন যে বিআরসি মূলত একটি শিক্ষা ও সহযোগিতার কেন্দ্র। বিআরসির কাছ থেকে মূল প্রত্যাশা হলো এটি একটি জ্ঞানকেন্দ্র ও কথা বলার প্ল্যাটফর্ম হিসাবে গড়ে উঠবে।

ফিলিপ গাইন

চা শ্রমিকদের অবস্থা নিয়ে তিনি বলেন, "মজুরি বঞ্চনার অর্থনৈতিক মাত্রা আমাদের বুঝতে হবে। বেদে সম্প্রদায়ের ক্ষেত্রে, আমাদের সামাজিক বৈষম্য এবং বঞ্চনা বুঝতে হবে। নগরায়ন ও উন্নয়নের যুগে বেদেদের একটি নতুন দিক নির্দেশনার প্রয়োজন।"

বন-নির্ভর মানুষদের ব্যাপারে তার পর্যবেক্ষণ, এদেরকে তথ্যের গুরুত্ব অনুধাবন করতে সক্ষম করা হয়েছে। এটা একটি গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধি যেখানে আমরা তাদেরকে সাহায্য করেছি।

ঋষি সম্প্রদায়ের উপর মিলন দাসের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে ড. রহমান বলেন, "তিনি বাড়তি বেশ কিছু বিষয় তুলে ধরেছেন। তাদেরকে সাধারণত ভৃত্য-রূপ কাজের জন্য উপযুক্ত ধরা হয়। সামাজিক ধারণার জন্য সামাজিক বৈষম্যের সৃষ্টি হয়। তাদের পরবর্তী প্রজন্মের জন্যও এই সামাজিক বৈষম্যের ধারা অব্যাহত রয়েছে।"

মিলন দাস পরিসংখানগত উপস্থাপনের পাশাপাশি তাদের সংস্কৃতি সংরক্ষণের জন্য একটি জীবনধারা জাদুঘর স্থাপনের পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, "ভবিষ্যতে এটি বিআরসির জন্য একটি বাড়তি সংযোজন হতে পারে।"

হরিজনদের বিষয়ে তার পর্যবেক্ষণ: প্রতিটি সম্প্রদায় ভিন্ন ধরনের বৈষম্যের সম্মুখীন হচ্ছে। হরিজনরা চিরাচরিতভাবেই শহর ও পৌরসভার পরিচ্ছন্নতাকর্মী। অতি সম্প্রতি, তারা যে বৈষম্যের সম্মুখীন হয়েছে তা হলো চাকরি হারানো। এই চাকরি অতীতে এই সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত ছিল; এখন তারা আর অগ্রাধিকারে নেই। হরিজন নেতা কৃষ্ণলালের প্রত্যাশা বিআরসিতে তাদের সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব থাকবে। তারা আসন্ন আদমশুমারিতে হরিজন জনসংখ্যার সঠিক গণনা আশা করছে।"

"শিবির জীবনে আবদ্ধ বিহারীরা রাজনৈতিক বৈষম্যের শিকার। তাদের সমস্যার ধরন আলাদা। তাদের পুনর্বাসন এবং শিক্ষার জন্য আমরা সরকারকে বলতে পারি," পর্যবেক্ষণ ড. রহমানের।

তিনি মূল বক্তার বক্তব্যের উপরে জোর দিয়ে বলেন বিআরসি কাজ করবে ফলাফল অর্জনের লক্ষ্যে। এটি কোনো প্রকল্পের ভেতরে সীমাবদ্ধ থাকবে না। প্রকল্পের বাহিরেও এটি বিদ্যমান থাকবে।

বিআরসির যাত্রাশুরুর সময়টি যথাযথ, কারণ এসডিজির সময়সীমা শেষ হতে এখনো আট বছর বাকি। এসডিজির আলোচ্যসূচির অগ্রাধিকারে থাকছে কাউকে পেছনে ফেলে নয়। তাদেরকে যদি আদমশুমারিতে আলাদা আলাদা গণনা করা হয় তবে তা হবে তাদের দৃশ্যমান করার একটি বড় পদক্ষেপ।

কমিউনিটি কণ্ঠ

রামভজন কৈরী, নির্বাহী উপদেষ্টা, বাংলাদেশ চা শ্রমিক ইউনিয়ন

রামভজন কৈরী

চা জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের জন্য আমরা কাজ করছি। কিন্তু গবেষণার মাধ্যমে আমাদের অবস্থা ও সমস্যাগুলো প্রকাশ করার ক্ষেত্রে আমাদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আমাদের সব আশা-আকাঙ্খা এবং অধিকার প্রতিফলিত হয়, এমন গবেষণা করা কঠিন কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ। ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার আমাদের কণ্ঠকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করতে পারে এবং সরকারের প্রতিনিধিদের কাছে আমাদের আশা-আকাঙ্খার কথা তুলে ধরতে সাহায্য করতে পারে। ২০১৯ সাল থেকে একজন চা শ্রমিকের দৈনিক মজুরি ১২০ টাকা। চা শ্রমিকের নিম্নতম মজুরি নির্ধারণের জন্য ২০১৯ সালে নিম্নতম মজুরি বোর্ড গঠন করা হয়। দুর্ভাগ্যজনক হলো এ মজুরি বোর্ড আমাদের মজুরি এক টাকাও না বাড়িয়ে বিদ্যমান ন্যূনতম সুযোগ-সুবিধা কমানোর অপচেষ্টা করলে মজুরি বোর্ডকে থামিয়ে দেওয়া হয়। এটি লজ্জাজনক। শ্রমিকরা মজুরিসহ ছুটির অধিকারের ব্যাপারে জানতো না। তারা কেবল ২০১৭ সাল থেকে সাপ্তাহিক মজুরিসহ ছুটি পেতে শুরু করে।

সেডের বৈশিষ্ট্য হলো এর গবেষণা ও অনুসন্ধানী কাজে গত ১৫ বছর ধরে চা জনগোষ্ঠীকে প্রাধান্য দিয়ে আসছে। চা শ্রমিকদের অধিকার এবং সুযোগ-সুবিধার সুরক্ষা প্রয়োজন। তারা তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয়। তথ্য-উপাত্ত হাতে নিয়ে ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলোর সাথে আমাদেরকে যোগাযোগ করিয়ে দিতে সুনির্দিষ্ট ভূমিকা পালন করতে পারে।

চা শ্রমিক ও তাদের জনগোষ্ঠীসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচয়: বাংলাদেশে চা বাগানের সংখ্যা ১৫৮ (পঞ্চগড় জেলার চা বাগানসমূহ বাদে)। সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগে এসব বাগানে কর্মরত ১৩৮,৩৬৬ জন শ্রমিক ও তাদের পাঁচ লাখের মতো মানুষের (পরিবারের সদস্যসহ) অধিকাংশ অবাঙালি। ব্রিটিশ কোম্পানিগুলো তাদের পূর্বপুরুষদেরকে ভারতের বিহার, মাদ্রাজ, উড়িষ্যা, অন্ধ্র প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর প্রদেশ এবং অন্যান্য জায়গা থেকে সিলেট বিভাগের চা বাগানগুলোতে কাজ করার জন্য চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক হিসেবে নিয়ে এসেছিল। চা বাগানসমূহে ৮০টির মতো জাতিসত্তা ও গোষ্ঠী পাওয়া গেছে যারা ১৩টি ভাষায় কথা বলে। চা শ্রমিকের বর্তমান নগদ মজুরি ১২০ টাকা।

সৌদ খান, বেদে সর্দার, মুন্সিগঞ্জ

সৌদ খান

বেদে জনগোষ্ঠী সীমাহীন সহিংসতা ও অবহেলার শিকার। আমরা কেবল ২০০৭ সালে ভোটাধিকার পেয়েছি। সমাজে আমাদের অবস্থান অনেক নিচে। মানুষ আমাদেরকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে। আমরা বাঙালি মুসলমান। আমরা গবেষণা থেকে জেনেছি আমরা আমাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত। আমাদের বর্তমান অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য শিক্ষা এবং চাকরির সুযোগ দরকার। আমাদের চাষযোগ্য জমি নেই। সরকার এবং এনজিওগুলো থেকে আমাদের সাহায্যের প্রয়োজন। শিক্ষিত মানুষদের সাথে আমাদের যোগাযোগ খুব কম। চাকরি হারানোর ভয়ে শিক্ষিত বেদেরা আপন গোষ্ঠীকে এড়িয়ে চলে। গবেষণায় অংশগ্রহণের কারণে এবং এ ধরণের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পেরে আজ আমি কথা বলতে পারছি। আমরা চাই আমাদের দাবি-দাওয়াগুলো যেন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলো শুনে এবং বিবেচনায় রাখে।

বেদে জনগোষ্ঠীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়: বেদে বাংলাদেশের একটি মুসলিম যাযাবর বা ভাসমান জনগোষ্ঠী। এরা বছরে দশ থেকে এগারো মাস জীবিকার তাগিদে দেশব্যাপী ঘুরে বেড়ায় এবং এক থেকে দুই মাস দেশের প্রায় ৭৫টি স্থানে নিজেদের পরিবার-পরিজন ও সম্প্রদায়ের মানুষদের সাথে দেখা-সাক্ষাতের জন্য মিলিত হয়। বাংলাদেশে এদের অনুমিত জনসংখ্যা তিন থেকে পাঁচ লাখের মতো। প্রায় ৫,০০০ বেদে বহর (দল) দেশের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়ায়। বেদেরা অত্যন্ত দরিদ্র এবং এদের মধ্যে সাক্ষরতার হার খুবই কম। এদের অধিকাংশই সম্পূর্ণ ভূমিহীন এবং অনেকে সরকারি খাস জমিতে বসবাস করেন। এরা সরকারি স্বাস্থ্যসেবা, খাস জমি ব্যবহার, সামাজিক নিরাপত্তা-বেষ্টনী কর্মসূচির আওতায় থাকা নানা সুবিধাসহ অন্যান্য সরকারি সুযোগ-সুবিধা ভোগ করার সুযোগ খুব কমই পান।

ইউজিন নকরেক, সভাপতি, জয়েনশাহী আদিবাসী উন্নয়ন পরিষদ

আমরা মধুপুর বনগ্রামের গারো এবং কোচ জনগোষ্ঠীর লোকেরা নিজেদেরকে অটোচথন বলে মনে করি। কিন্তু দুঃখজনকভাবে আমরা আমাদের প্রথাগত অধিকার থেকে বঞ্চিত। মধুপুর বন গ্রামে প্রায় ২০,০০০ গারো আছে যারা প্রায় সবাই সম্পূর্ণরূপে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত এবং ৩,৫০০ কোচ জনগোষ্ঠীর মানুষ আছে যারা সবাই হিন্দু। আমরা ফিলিপ গাইনকে ১৯৮০-এর দশক থেকে বনের গ্রামগুলো চষে

বেড়াতে দেখেছি। তিনি এবং সেড বন সংক্রান্ত বিষয় এবং আমাদের অবস্থার উপর গভীর ভাবে গবেষণা ও অনুসন্ধান কাজে জড়িত। সেডের সাম্প্রতিক বই, 'মধুপুর: দ্য ভ্যানিশিং ফরেস্ট অ্যান্ড হার পিপল ইন এগোনি' আমাদের জন্য একটি পথনির্দেশক বই। এই বইটিতে মধুপুর এবং মধুপুরের আদিবাসীদের সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আছে। বইটি পড়ে আমরা গবেষণা, অনুসন্ধান ও বিশ্লেষণ-এর গুরুত্ব বুঝতে পেরেছি। তবে আমাদের আপন জনগোষ্ঠী ও দাবি-দাওয়া সঠিকভাবে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে আমাদের দক্ষতার অভাব আছে। সেড আমাদেরকে গবেষণা কাজের কলাকৌশল এবং মাঠ পর্যায় থেকে কীভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে, সে ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দিয়ে আসছে। এখন আমরা মধুপুরের উপর বই, প্রতিবেদন, ডকুমেন্টারি ফিল্ম এবং ফটোগুলি আরও কার্যকরীভাবে ব্যবহার করতে পারি। এগুলো অর্থপূর্ণ অ্যাডভোকেসির জন্য খুবই জরুরি। আমি বিশ্বাস করি ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার এর উদ্বোধনে সেড, পিপিআরসি এবং আমরা সবাই একসাথে মিলে আমাদের অধিকারের জন্য কাজ করতে পারবো। তথ্য-উপাত্ত হাতে নিয়ে কীভাবে সরকারি সংস্থাগুলোর উপর প্রভাব খাটানো যায়, আমরা সেটা এখন আরও ভালোভাবে বুঝতে পারি।

ইউজিন নকরেক

মধুপুর বন এবং এখানকার ক্ষুদ্রজাতিগোষ্ঠীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়: মধুপুর উপজেলার আয়তন ৯১,৫৪৫.১৩১ একর (৩৭০.৪৭ বর্গ কিমি) যার মধ্যে ৪৫,৫৬৫.১৮ একর বনভূমি। বনভূমির মধ্যে ১১,৬৭১.২১ একর সংরক্ষিত বন, ২০,৮৩৭.২৩ একর মধুপুর জাতীয় উদ্যান, ৭,৮০০ একর রাবার বাগান এবং ৫,০০০ একর সামাজিক বনায়ন (আনুমানিক)। বর্তমানে অনুমিত বনের আয়তন ৯,০০০ একর! মধুপুর উপজেলার জনসংখ্যা ২৯৬,৭২৯ (আদমশুমারি ২০১১) যার মধ্যে ১৭,৩২৭ জন গারো (সেড জরিপ ২০১৮) এবং ৩,৪২৭ জন কোচ বা বর্মন (সেড জরিপ ২০১২)। মধুপুর উপজেলার পার্শ্ববর্তী মুক্তাগাছা, ফুলবাড়িয়া এবং জামালপুর সদর উপজেলায় গারো জনসংখ্যা ১,৯৬৩ বা ৪৮৬ পরিবার (সেড ইনভেন্টরি ২০১৮)।

সূত্র: সরকারি ওয়েবসাইট (http://madhupur.tangail.gov.bd/), বাংলাদেশের বন বিভাগ, সেড জরিপ ২০১২ এবং ২০১৭-২০১৮।

জুয়ামলিয়ান আমলাই, মানবাধিকার কর্মী, পার্বত্য চট্টগ্রাম

জুয়ামলিয়ান আমলাই

আমি ১৯৯৭-১৯৯৮ সাল থেকে সেডের সাথে জড়িত এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকার পরিবেশ, সংস্কৃতি ও মানুষদের নিয়ে এর গবেষণা কাজের সাথে পরিচিত। চাক এবং খুমি জনগোষ্ঠীর উপর সেডের জরিপ ও বইপত্র থেকে আমরা এ জনগোষ্ঠীর পরিসংখ্যানিক তথ্য পেয়েছি। আমরা চাই একই ধরণের জরিপ ম্রো ও বম জনগোষ্ঠীর উপরও হোক। পরিসংখ্যানিক তথ্যগুলো হাতে থাকলে আমরা দক্ষতার সাথে আমাদের গ্রামগুলো পরিচালনা করতে পারবো। আমাদের হাতে যদি প্রাথমিক তথ্যগুলো থাকে, তাহলে আমরা অর্থবহ মতামত দিয়ে আমাদের অধিকার আদায়ের কার্যক্রম আরও ভালোভাবে করতে পারবো।

সেড নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র 'চকোরিয়া সুন্দরবন: যে বনে গাছ নেই' আমাদের দেশের ম্যানগ্রোভ বন, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং অন্যান্য জায়গার বনায়ন ধ্বংসের ভয়াবহতার একটি চমৎকার বাস্তব উপস্থাপন। আমরা যারা পার্বত্য চট্টগ্রামে আছি, বেশ আতঙ্কে আছি। পার্বত্য চট্টগ্রাম-এর সুরক্ষার জন্য যে আইনটি রয়েছে তা এখন হুমকির সম্মুখীন। আমরা জানি ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার আমাদের সব সমস্যার সমাধান করতে পারবে না কিন্তু সেডের গবেষণা কাজ ও বইপত্র পার্বত্য চট্টগ্রামবাসীকে আপন অধিকার সম্পর্কে সচেতন করতে সাহায্য করতে পারে। তথ্য-উপাত্ত ছাড়া আমরা কোনো কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারবো না।

সিয়ং খুমি

খুমি জাতিগোষ্ঠীর প্রতিনিধি সিয়ং খুমি, জুয়ামলিয়ান আমলাই এর কথার সাথে আরও কিছু কথা যোগ করেন। সেড আমাদের খুমি জনগোষ্ঠীর পরিবারগুলোর উপর একটি জরিপ চালিয়েছিল। আমাদের প্রধান সমস্যা হলো ভৌগলিক অবস্থানের কারণে আমরা শিক্ষা-দীক্ষায় পিছিয়ে আছি। এছাড়া আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ এবং আমরা আমাদের জমি হারাচ্ছি। ১৯৯১ সালের সরকারি আদমশুমারি অনুসারে বাংলাদেশে খুমি জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল ১,২৪১ কিন্তু ২০১৪ সালে সেডের এক গবেষণায় দেখা গিয়েছে খুমি জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ২,৮৯৯। খুমি জনগোষ্ঠীর মানুষেরা মূলত বান্দরবান পার্বত্য জেলার থানচি, রুমা ও রোয়াংছড়ি উপজেলায় বসবাস করে। রাঙ্গামাটি জেলার

বিলাইছড়ি উপজেলায় দশটি খুমি পরিবার এবং বান্দরবান সদরে একটি খুমি পরিবার বাস করে।

পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং এখানকার ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি: বাংলাদেশের ১৩,২৯৫ বর্গকিলোমিটার বা ১০ শতাংশ জুড়ে পর্বতময় এই অঞ্চলটি ভৌগলিক অবস্থা এবং মানববসতির দিক থেকে বাংলাদেশের বাকি অঞ্চল থেকে একেবারে আলাদা। ১১টি স্বতন্ত্র আদিবাসী সম্প্রদায়ের (চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, লুসাই, বম, পাংখো (পাংখুয়া বা পাংখু), ম্রো, খুমি, চাক, খিয়াং এবং তঞ্চঙ্গ্যা) বাসস্থান এ পাহাড়ি এলাকা। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বাধীনতার সময়ও এখানে বাঙালি জনসংখ্যা ছিল খুবই কম-প্রায় ২.৫ শতাংশ, যা ১৯৯১ সালে (১৯৯১ আদমশুমারি) ১০ শতাংশ থেকে ১৯৫১ সালে ৪৮.৫৭ শতাংশে পৌঁছায় এবং ১৯৮১ সালে এসে দাঁড়ায় ৩৫ শতাংশে (স্যান্ডেল ১৯৯২: ৯৫)। ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুসারে বাংলাদেশের ২৭টি জাতিগোষ্ঠীর মোট জনসংখ্যা ছিল ১৫,৮৬,১৪১, যা তখনকার জনসংখার ১.১ শতাংশ। এদের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিগোষ্ঠীসমূহের জনসংখ্যা ছিল ৮,৪৫,৫৪১ এবং সমতলের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সংখ্যা ছিল ৭৪০,৬০০ (শিশির মোড়ল, *প্রথম আলো*, ৩১ আগস্ট ২০১৩)। ২০১৯ সালে হালনাগাদ করা এই তালিকায় পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিগোষ্ঠীর সংখ্যার কোনো পরিবর্তন ছাড়াই ৫০টি জাতিগোষ্ঠীর সরকারি তালিকা অন্তর্ভুক্ত হয়। সরকারি তালিকায় যোগ করা জাতিগোষ্ঠীসমূহের কোনো সরকারি পরিসংখ্যান নেই।

আলেয়া আক্তার লিলি, সভাপতি, সেক্স ওয়ার্কারস নেটওয়ার্ক

আমরা অনেক বছর ধরে সেডের সাথে গবেষণা কাজে জড়িত। আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে যৌনপল্লী ও ভাসমান যৌনকর্মীদের উপর একটি গবেষণা কাজে জড়িত ছিলাম। আমাদের দুঃখ কষ্টের কোনো শেষ নেই। আমাদের জীবন একটা যুদ্ধ। আমরা প্রতিনিয়ত সহিংসতার শিকার হই। যৌনকর্মী এবং তাদের ছেলেমেয়েদের সমাজের মূল স্রোতের বাইরের মানুষ বলে বিবেচনা করা হয়। যৌনকর্মীর ছেলেমেয়েরা স্কুলে ভর্তি হতে অনেক বাধার সম্মুখীন হয়। আমি আশা রাখি যৌনকর্মীরা ধীরে ধীরে সমাজের মূলধারায় গ্রহণযোগ্যতা পাবে। ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টার-এর একটি জ্ঞানভাণ্ডার হিসেবে কাজ করা উচিত এবং আমাদেরকে সমান অধিকার সম্পন্ন মর্যাদাবান নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করা উচিত। প্রকৃত অর্থে সেড যৌনকর্মীদের উপর গবেষণা ও প্রকাশনার কাজে পথ প্রদর্শক।

আলেয়া আক্তার লিলি

যৌনকর্মীদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়: সেড ২০১৮ সালের গবেষণায় টাঙ্গাইল, জামালপুর, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, রাজবাড়ী,

যশোর, বাগেরহাট এবং পটুয়াখালী জেলার ১১টি যৌনপল্লীতে ৩,৭২১ জন নারী যৌনকর্মী পেয়েছে। তবে সরকারি হিসাবে দেশে মোট নারী যৌনকর্মীর সংখ্যা আরো অনেক বেশি—৯৩,০০০। এদের ৩৬,৫৯৩ জন রাস্তায়, ৩৬,৫৩৯ জন বাসাবাড়ীতে এবং ১৫,৯৬০ জন হোটেলে কাজ করে। নারী যৌনকর্মী ছাড়াও ১১৯,৮৬৯ জনের মতো এমএসএম (যেসব পুরুষ অন্য পুরুষের সাথে যৌনকর্ম করে) এবং ১০,০০০ জনের মতো হিজড়াও আছে।

মিলন কুমার দাস, নির্বাহী পরিচালক, পরিত্রাণ

ঋষি জাতিগোষ্ঠীর মানুষদের মূল স্রোতের বাঙালি জনগোষ্ঠী অচ্ছুত বিবেচনা করে। আমরা চার লাখ ঋষি জাতিগোষ্ঠীর মানুষ সাতক্ষীরা, খুলনা এবং বাগেরহাট জেলায় থাকি। সমাজে আমরা অস্পৃশ্য হিসেবে বিবেচিত এবং প্রতিনিয়ত আমরা বঞ্চনা ও নিপীড়নের শিকার। আমরা আজ পর্যন্ত বড় কোনো গবেষণার অংশ হতে পারিনি। আমাদের শিক্ষার সুযোগ নেই। স্কুলে পরিচ্ছন্নতা কর্মী থাকার পরেও আমাদের ছেলেমেয়েদের দিয়ে বাথরুম পরিষ্কার করার মতো নিম্নমানের কাজ করানো হয়। আমাদের বাচ্চাদের জন্য এ ধরণের কাজ অপমানজনক এবং এটি তাদের মানসিকতার উপরও চাপ ফেলে। আমরা ২০০৭ সাল থেকে বৈষম্য দূরীকরণ আইনের দাবি জানিয়ে আসছিলাম কিন্তু সরকার যে আইনটি করেছে (বৈষম্য বিরোধী আইন) তা মোটেও সহায়ক নয়। আমরা দেশের রাজস্বে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখি কিন্তু আমাদের নায্য পাওনা আমরা পাই না। আমরা আমাদের বিলুপ্তপ্রায় সংস্কৃতি সংরক্ষণের জন্য একটি জাদুঘর চাই। ব্রাত্যজন রিসোর্স সেন্টারের কাছে প্রত্যাশা আমাদের অদৃশ্যতা থেকে রক্ষা করুন।

ঋষি জাতিগোষ্ঠীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়: বঙ্গের ঋষি জনগোষ্ঠী বংশপরম্পরায় চর্মকার, চামড়া শ্রমিক এবং বাদক। এ জনগোষ্ঠীর মানুষের বসবাস মূলত ভারতের উত্তর প্রদেশ, মধ্য প্রদেশ এবং বিহার রাজ্যে। ভারতের হিন্দু সমাজে 'দলিত' বা শোষিত জনগোষ্ঠীসমূহের মধ্যে এরা একটি। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি জেলায় ঋষি জনগোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করেন। তার মধ্যে যশোর, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট এবং খুলনা জেলায় এদের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। ঋষিদের অধিকার নিয়ে কাজ করা সংগঠন পরিত্রাণ-এর দাবি, শুধুমাত্র খুলনা বিভাগে ঋষিদের সংখ্যা ১৮৬,৭৯৭। সেড-এর সহযোগিতা ও তত্ত্বাবধানে পিপিআরসি ২০১৭-২০১৮ সালে ঋষি অধ্যুষিত ৫৩টি পাড়া বা গ্রামে একটি গবেষণা পরিচালনা করে। গবেষণায় এসব পাড়া বা গ্রামে ৯,০৮৮টি পরিবারে ৫১,৭৪৫ জন ঋষি পাওয়া গেছে।

মিলন কুমার দাস

কৃষ্ণলাল, সভাপতি, বাংলাদেশ হরিজন ঐক্য পরিষদ

কৃষ্ণলাল

আমরা নিজেদের হরিজন বলি। দলিত শব্দটি ব্যবহার না করে আমরা এ শব্দটি ব্যবহার করি কারণ দলিত শব্দটিকে আমরা অপমানজনক বলে মনে করি। কয়েক প্রজন্ম ধরে আমরা ঢাকা এবং অন্যান্য শহর পরিষ্কার করার কাজ করে আসছি। তা সত্ত্বেও বর্তমানে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মাত্র শতকরা ৩০ ভাগ পরিচ্ছন্নতা কর্মী হরিজন জনগোষ্ঠীর। দিনে দিনে আমরা আমাদের যুগ যুগ ধরে করে আসা কাজ হারাচ্ছি। কাগজে কলমে পৌরসভার শতকরা আশি ভাগ পরিচ্ছন্নতাকর্মীর চাকরি হরিজনদের পাওয়ার কথা কিন্তু বাস্তবে মাত্র চার ভাগ চাকরি আমরা পাই। ইতিমধ্যে সরকারকে আমরা এ ব্যাপারে চিঠি দিয়েছি। আমরা সরকারি জমিতে থাকি এবং সম্পূর্ণরুপে ভূমিহীন এক জনগোষ্ঠী। ঢাকা সিটি কর্পোরেশন আমাদেরকে সরকারি জমিতে ভবনে অ্যাপার্টমেন্ট দেওয়ার কথা দিয়েছিল। যদিও সেই অ্যাপার্টমেন্টগুলো যারা পরিচ্ছন্নতাকর্মী হিসেবে কাজ করছেন, শুধুমাত্র তাদের জন্য।

হরিজনদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়: হরিজন একটি পেশাজীবী গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়। এরা ঐতিহ্যগতভাবে 'সুইপার' হিসেবে পরিচিত এবং এদের অনেকে নিজেদের 'দলিত' বা সামাজিকভাবে বাদ-পড়া মানুষ হিসেবে বিবেচনা করেন। 'দলিত' শব্দটি হিন্দু সম্প্রদায়ের বর্ণাশ্রম বা জাতিভেদ প্রথা অনুসারে চারটি শ্রেণির বাইরে অর্থাৎ শুদ্রেরও নীচে যারা অবস্থান করেন তাদেরকে বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ দলিতরা হিন্দু বর্ণাশ্রম অনুসারে পঞ্চম বর্ণের মানুষ। এমনকি শুদ্রদের কাছেও এরা অচ্ছুত। এরা সমাজে অত্যন্ত অবহেলিত এবং সবচেয়ে বেশি সুবিধাবঞ্চিত। হরিজন জনগোষ্ঠীর মানুষ পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন জেলা বাদে বাংলাদেশের সকল জেলার সিটি করপোরেশন ও পৌরসভায় পরিচ্ছন্নতা কর্মী হিসেবে কাজ করেন। চা শ্রমিকদের ন্যায় হরিজনদেরকেও ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে ভারতের উড়িষ্যা, বিহার এবং উত্তর প্রদেশসহ বিভিন্ন জায়গা থেকে বাংলাদেশে নিয়ে আসা হয় এবং ময়লা-আবর্জনা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজে লাগানো হয়। গত ২০০ বছরের অধিক সময় ধরে এ কাজই তাদের প্রধান পেশা। বাংলাদেশে এদের অনুমিত জনসংখ্যা এক লাখের মতো। পেশাগত কারণে হরিজনরা বাংলাদেশের সব থেকে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীগুলোর একটি যারা নানান সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যায় নিমজ্জিত।

এম. শওকত আলী, সাধারণ সম্পাদক, স্ট্র্যান্ডেড পাকিস্তানীজ জেনারেল রিপ্যাট্রিয়েশন কমিটি (এসপিজিআরসি)

এম. শওকত আলী

আমরা, বিহারিরা বাংলাদেশের ১৩টি জেলার ৭০টি ক্যাম্পে বসবাস করি। স্বাধীনতার আগে আমাদের জীবনমান ভালো ছিল। ক্যাম্পে আমাদের মানুষ হিসেবে কোনো সম্মান নেই। ক্যাম্পে প্রতিটি পরিবার সাধারণত একটি ছোট ঘর পায় (৮ ফুট x ৮ ফুট) । আমাদের কোনো প্রাইভেসি নেই। জেনেভা ক্যাম্পেই প্রায় ৫,৫০০ পরিবার থাকে যারা সবাই ১৫০টি কমন বাথরুম ব্যবহার করে। ঢাকার মোহাম্মদপুরের জেনেভা ক্যাম্পসহ ছয়টি ক্যাম্পের বাসিন্দাদের জন্য মাত্র একটি স্কুল রয়েছে। বাচ্চারা লেখাপড়া করার সুন্দর পরিবেশ পায় না। তারপরও আমি আশাবাদী প্রধানমন্ত্রী আমাদের পুর্নবাসিত করার যে কথা দিয়েছিলেন, তা তিনি রাখবেন।

বিহারিদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়: উর্দুভাষী বিহারি জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের ১৩টি জেলার ৭০টি ক্যাম্পে বসবাস করে। এসব ক্যাম্পের অধিকাংশ রাজধানী ঢাকায় অবস্থিত। মুসলিম ধর্মাবলম্বী বিহারিরা ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির সময় তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে (বর্তমানে বাংলাদেশ) চলে আসে। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধকালে বিহারিরা পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করে। যুদ্ধের পর তাদের একটি অংশ পাকিস্তানে চলে যায়, বাকীরা বাংলাদেশে আটকে পড়ে। ২০০৮ সালের ১৯ মে হাইকোর্ট এক রায়ে ১৫০,০০০ বিহারি শরণার্থীকে নাগরিকত্ব প্রদান করে। এরা ১৯৭১ সালে নাবালক ছিল অথবা পরবর্তীতে জন্ম নেয়। তবে নাগরিকত্ব পেলেও এরা স্থায়ী ঠিকানা ও মৌলিক সুযোগ-সুবিধাবিহীন অবস্থায় ক্যাম্পগুলোতে মানবেতর জীবনযাপন করছে। এরা প্রতিনিয়ত বঞ্চিত হচ্ছে তাদের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অধিকার হতে। বর্তমানে বিহারিদের প্রকৃত সংখ্যা নিয়ে বিতর্ক আছে। একটি সূত্রের তথ্যমতে, ক্যাম্পে বসবাসকারী বিহারিদের অনুমিত সংখ্যা ৩০০,০০০-এর মতো (২০১৭)। পিপিআরসি দেশের ১৩টি জেলার ৩০টি সুপরিচিত বিহারি ক্যাম্প ও বসতিতে গবেষণা চালিয়েছে। গবেষণায় ৩০টি ক্যাম্পে মোট ২৬৫,৫৩১ জন বিহারি পাওয়া গেছে।

ইভান আহমেদ কথা, সচেতন হিজড়া নাগরিক সংস্থা

বাংলাদেশ সরকার ২০১৩ সালে হিজড়া জনগোষ্ঠীকে তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। আমাদের জন্য কি পরিমাণ সরকারি বাজেট আছে, সে সম্পর্কে আমরা জানি না। আমাদের জন্য কি বরাদ্দকৃত বাজেট

এবং তা থেকে এখন পর্যন্ত কি পরিমাণ আমরা পেয়েছি, সে সম্পর্কে আমরা জানতে চাই। আমাদের জন্য বরাদ্দকৃত ভাতা আমরা পাচ্ছি কিনা, সে ব্যাপারে আমি সন্দিহান। হিজড়া সম্প্রদায় তাদের প্রধান ঐতিহ্যবাহী পেশাগুলো নির্বিঘ্নে চালিয়ে যেতে চায়, যেগুলোর মধ্যে রয়েছে বাধাই তোলা (নাচ ও গান পরিবেশনের মাধ্যমে নবজাতককে আশীর্বাদের বিনিময়ে টাকা সংগ্রহ); চোল্লা মাঙ্গা (বাজার থেকে চাঁদা সংগ্রহ) এবং যৌন কাজ।

ইভান আহমেদ কথা

আজকাল হিজড়ারা বাস এবং অন্যান্য যানবাহন থেকে টাকা তোলে। তারা বিভিন্ন উৎসবেও চাঁদা তোলে। আমরা জমি, বাড়ি কিনতে পারি না। অনেক সময় আমাদের পর্যাপ্ত খাবারও থাকে না। আরেকটি গুরত্বপূর্ণ বিষয় হলো আমি আদমশুমারির কাজে জড়িত হয়ে দেখেছি সেখানে নারী-পুরুষ ব্যতীত অন্য কোনো লিঙ্গের উল্লেখ নেই। (বাংলাদেশ ব্যুরো অব স্ট্যাটিস্টিকস জানিয়েছে যে ২০২২ সালের আদমশুমারিতে হিজড়াদের আলাদা করে গণনা করা হবে)।

হিজড়াদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়: সেভ দ্য চিলড্রেন এবং ইউএনআইডি'র সহযোগিতায় বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের 'ম্যাপিং স্টাডি অ্যান্ড সাইজ এস্টিমেসন অফ কী পপুলেশনস ইন বাংলাদেশ ফর এইচআইভি প্রোগ্রাম ২০১৫-২০১৬' শীর্ষক এক গবেষণায় হিজড়া জনসংখ্যা হিসাব করা হয়েছে সর্বনিম্ন ৬,৮৬৭ থেকে সর্বোচ্চ ১০,১৯৯ পর্যন্ত। এদের সবথেকে বড় অংশের (৩৫%) বসবাস ঢাকায়, তারপরে সিলেট (১৭%) এবং চট্টগ্রাম (১৬%)। সমীক্ষা অনুসারে, হিজড়াদের একটি বড় অংশ (৭৭.৭%) নিজেদের যৌনকর্মী হিসেবে চিহ্নিত করে।

রিপোর্ট: ফিলিপ গাইন, অর্পিতা দাস ও নূরিনা দুর্বা গাইন